লিটল ম্যাগ উদ্যোগ
লিটল ম্যাগাজিন ও তাদের প্রকাশিত
বইয়ের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, দোতলা, কলকাতা ৭
(৯১৬৩৬৭৮৪৮১, ৯৮৭৪৯৭২২২৭)

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 21 1 May 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ একবিংশ সংখ্যা ১ মে ২০১৩ বুধবার ২ টাকা

• চিট কী পৃ ২ • আইনে চিট পৃ ২ • শাহবাগ পৃ ৩ • এইডস পৃ ৩ • জনশৌচাগার পৃ ৩ • গুজরাত পৃ ৩ • পাখি পৃ ৪ • পুরুলিয়া পৃ ৪ • বসুন্ধরা পৃ ৪

উদ্ধারকাজের মুখ

শাহবাগ চত্বরের ফেসবুক পেজ-এ ব্লগার আরিফ জেবতিক-এর প্রকাশনা : এই মেয়েকে চিনতাম না, আগে দেখিনি কখনোই। নাম সানজিদা নদী, পেশায় প্যারামেডিকস। শাহবাগ থেকে যখন ফিল্ড হসপিটালের দ্বিতীয় টিমটা রওনা হয়ে যায়, তখন শাহবাগে এসে উনিও সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন অন্য কোনো গাড়ি ছিল না, ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে অন্যান্য কিছু স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে ওঁকেও ট্রাকে তুলে দেওয়া হল।

সাভারে আমারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল টিমগুলোর সমন্বয় করা। তো আমি ওঁকে ধ্বংসস্তুপে যেতে দেই না, হাসপাতালের কাজে লাগিয়ে রাখলাম।

কিন্তু রাত ১২টায় দেখি উনি হেলমেট পরে অন্যান্য জিনিস নিয়ে একটা টিমে ভিড়ে গেছেন। টিম পাঠানোয় কিছু বেসিক নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছিল, ৮ জন করে ভেতরে ঢুকবে, ভেতরে ঢুকে ২ জন করে ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক দেড়ঘন্টা পরে বাইরে বের হয়ে আসবে, এক সেকেন্ডও দেরি করবে না। আরেকদল বাইরে রেডি থাকবে, ভেতরের দল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দল সেখানে দায়িত্ব নেবে। যেহেতু ২ জন করে একেকটা উপদল, সানজিদা নদীকে ওই সময় দলে নিলে বেজোড় হয়ে যায়। একা কাউকে কোনো গর্তে ঢুকতে দিচ্ছিলাম না আমরা। আমি ওঁকে কড়া করে নিষেধ করলাম। তারপরও উনি ঘ্যানঘ্যান করতে থাকলেন, আমি প্রথমে খুব নরম ভাবে, পরে গরম হয়ে জানিয়ে দিলাম যে প্রত্যেককে শৃংখলা মানতে হবে, এখানে স্বেচ্ছাধীন কিছু চলবে না। তারপরও ওঁর আগ্রহ দেখে পরের ব্যাচে ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম।

বাকিটা এখানে বলব না। জয় ইতিমধ্যেই ওঁকে সুপারওম্যান আখ্যা দিয়েছে। এটাও কম হয়ে যায়।

১৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকার শিক্ষা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব আখতার হোসেনের স্মরণসভা হয়। রিপোর্ট কাজী ফয়জল নাসের, কানখুলি, মহেশতলা।

‘তিনি সুদ নেওয়ার কথা ভাবতেও পারতেন না’

.. তার ব্যাঙ্কে কোনো অ্যাকাউন্টও ছিল না’। আব্বার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলছিলেন ফয়জুর রহমান। অসহ্য গরমে ঘরের মধ্যে টিকতে না পেরে বৈশাখীর সন্ধ্যেয় ছাদে বসে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে বড়ো পুকুর ধারে নিমগাছ। দক্ষিণে বাঁশবাগানের মাথায় চাঁদ উঠি উঠি করছে। চারধারে ‘গুবাক তরুর সারি’। বাতাসে কামিনী ফুলের ঘ্রাণ।

তিনি বললেন, ‘আব্বা তো কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিলেন। আমরা পুরুষানুক্রমে এখানে এই বাড়িতে চারশ বছর বাস করছি। বিড়া এলাকাতে। তো দেখুন, আমরা ছয় ভাই। তাদের মধ্যে আমরা তিনজন টাকা ব্যাঙ্কে রেখে সুদ খাওয়ার কথা ভাবি না। বাকি দুই ভাইয়ের অবশ্য অন্য রকম বিচার। সুদ হল হারাম, বুঝলেন তো। আমি তো সারদায় টাকা রাখার কথা ভাবতেও পারি না। তবু ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যে সুদ হয়, তা আমি দান করে দেই। তাকেও বলি, এই দানের জন্য কোনও পুণ্যের আশাও করি না। এতিমখানার মতো যেসব জায়গায় গরিব বাচ্চারা থেকে পড়াশুনা করে, সেখানেও দান করা যায়।

আমার অবশ্য তেমন টাকাপয়সা নেই। আমি একটা সংস্থায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতাম। গত কয় মাস হল সেই কাজটা করছি না। চাষবাসও আছে কিছুটা। আমি, তা ধরুন গিয়ে বছর তিরিশ হল এমন একটা বোধ নিয়ে চলছি। আমার বয়স পঞ্চাশের কাছে হল। বাকি জীবনটাও এমন করে চলে যাবে, কি বলুন। মাস তিনেক হল, বড়ো মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। সে এমএ পাশ করে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিল। মেয়ের বিয়েতে পণ বা যৌতুক দেইনি। যৌতুক চাইলে সেখানে আমার মেয়ে বিয়েও করত না। সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে।

আমি তো কোর্ট ম্যারেজ করেছি। কলেজ লাইফের প্রেম, স্ত্রী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, স্মৃতিকণা ভৌমিক। তার বাবার বাড়ির সাথে সম্পর্ক নেই সেই থেকেই। আমার ছোটো মেয়ে জুঁই বোটানি অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়ছে। সে তো ছেলেবেলা থেকেই প্যান্ট শার্ট পড়ে। ধর্মে তো কোথাও বাধা নেই। অনেকে ধর্মটা বিকৃত করে ব্যাখ্যা করে। আমি ধর্মপ্রাণ। লোভ দমন করতে হবে বুঝলেন। টাকার লোভে আমি কখনও চিটফান্ডে টাকা রাখব না। দেখুন পৃথিবী নিয়ে আমার বড়ো ভাবনা হয়। অপচয় সইতে পারি না। জীবনে এতটুকু অপচয় করি না। নাইট ডিউটি করে ফেরার পথে রাস্তায় আলো জ্বলে থাকতে দেখে সেগুলো বন্ধ করতে লেগে যেতাম। রাস্তার কল বন্ধ করতে করতে রাস্তায় চলি। লোকে পাগল ভাবে। বলুন পৃথিবীটা বড়ো বিপন্ন। আমাদের ভাবা দরকার।’

শুনলেন বঙ্কিম, বিড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২৯ এপ্রিল

কারখানা ধসে ফের শ্রমিকদের গণমৃত্যু বাংলাদেশে, উদ্ধারকাজে শাহবাগ প্রজন্ম

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৩০ এপ্রিল •

ফের এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে বাংলাদেশ, কারো মতে এ এক সংগঠিত গণহত্যা। সাভারে ২৪ এপ্রিল সকাল নটায় রাণা প্লাজা নামে একটি নয়তলা বাড়ি ধসে পড়ে প্রায় চারশোজন মারা গেল, যারা মূলত পোশাকশিল্পের শ্রমিক। ২৯ এপ্রিল রাত এগারোটা পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৩৮৫ জনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে ২০১ জন মহিলা, ১২৯ জন পুরুষ। জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ২,৪৩৭ জনকে। এদের মধ্যে প্রায় ৪০০ জন বিভিন্ন হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি। এখনও নিখোঁজ শতাধিক। এখন আর জীবিত মানুষ পাওয়ার আশা নেই। ভবনটির দুটি সিঁড়ি ছিল। সামনের দিকের সিঁড়ি ও লিফট দিয়ে মালিক ও ক্রেতারা যাতায়াত করত। পেছনের দিকের সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করত শ্রমিকরা, যাদের বেশিরভাগই মহিলা। পেছনের দিকের সিঁড়িতে আরও কিছু মৃতদেহ মিলতে পারে বলে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছে।

এই অভিশপ্ত ভবনটিতে বিপর্যয়ের দু-দিন আগে ফাটল দেখা গেছিল। আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সমস্ত শ্রমিককে বাইরে বার করে আনা হয়েছিল। কিন্তু ফের তাদের কাজে ঢুকতে বাধ্য করা হয়।

ঘটনার পরদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা বাংলাদেশ জুড়ে পোশাকশিল্প শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায়, সড়ক অবরোধ করে, গাড়ি ভাঙচুর করে। বেগতিক দেখে সমস্ত পোশাক কারখানা একদিনের জন্য বন্ধ রাখে সরকার। ঘটনার চারদিনের মাথায় ওই ভবনের মালিককে ভারতের সীমান্ত লাগোয়া পেট্রোপোল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৩০ এপ্রিল এই শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

বাংলাদেশে পোশাক-শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল চলছেই। নয়ের দশকের শুরু থেকেই আগুন লেগে, ভবন ধসে বহু পোশাক-শ্রমিক মারা গেছে। তবে এই রাণা প্লাজার মতো বড়ো মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন বাংলাদেশ হয়নি কখনও। গত বছর তাজরিন ফ্যাশন নামে একটি পোশাক কারখানায় আগুন লেগে শতাধিক পোশাক-শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই পোশাক কারখানার মালিক আগুন লাগার পর গেট বন্ধ করে দিয়েছিল, শ্রমিকদের বেরোতে দেওয়া হয়নি, পাছে জিনিসপত্র চুরি যায়। তাজরিন অগ্নিকাণ্ডের পরও সেই মালিকের কোনো শাস্তি হয়নি আজও।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প মূল রপ্তানি শিল্প। দেশটির মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশই এই পোশাক। বেশির ভাগটাই রপ্তানি হয় ইউরোপে। ইউরোপ আমেরিকার দানবাকৃতি রিটেল, যেমন ওয়ালমার্ট প্রভৃতি এদের ক্রেতা। তাজরিন ফ্যাশনস্-এ তৈরি হওয়া পোশাকের ক্রেতা ছিল ওয়ালমার্ট। তাজরিন অগ্নিকাণ্ডের পর বিভিন্ন জায়গা থেকে আওয়াজ ওঠে, যাতে ওয়ালমার্টের মাল যে সব কারখানা থেকে নেওয়া হচ্ছে, সেই সব কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট দাবি করে। কিন্তু খরচ বেড়ে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে তারা কারখানাগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করার বিষয়টি এড়িয়ে যায়। বস্তুত, দানবাকৃতি রিটেলগুলি সস্তায় পোশাক বিক্রির উদ্দেশ্যে এই ঠুনকো এবং বিপজ্জনক কারখানাগুলি থেকে পোশাক তৈরিতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। তার মূল্য চোকাতে হয় বাংলাদেশ সহ অন্যান্য গরিব দেশের শ্রমিকদের।

সাভারের মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পর উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নামে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, শাহবাগ চত্বরের প্রজন্ম। কোনো রাজনৈতিক নেতাকে এই উদ্ধারকাজের ধারেকাছে দেখা যায়নি। সাভারের অদূরে একটি প্রাথমিক চিকিৎসালয় স্থাপন করে গণজাগরণ মঞ্চ। এক অভূতপূর্ব উদ্যোগে মানুষের তোলা টাকায় আটকে পড়া মানুষের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার, কংক্রিটের স্ল্যাব কাটার জন্য ছোটো বড়ো মেশিন, বড়ো আলো, ওষুধপত্র আসে। উদ্ধারকাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও মাঠে নেমে পড়ে তারা। দু-দিনে প্রায় দেড় হাজার ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয় আহতদের জন্য।

এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের উদ্ধারকার্য চালিয়ে অনেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

কুদানকুলাম পরমাণু প্রকল্প বিশ বাঁও জলে

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৭ এপ্রিল •

১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণস্বামী বলেছিলেন, এপ্রিল মাসের মধ্যেই কমিশনিং হবে কুদানকুলাম প্রকল্পের। কিন্তু তা হল না। অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল কমিশনিং। তবে সেই খবর দেওয়ার সৌজন্যটুকু আর নারায়ণস্বামী বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, এমনকী কোনো পরমাণু কর্তাব্যক্তিরা দেখায়নি। সেকথা জানা গেল কুদানকুলাম প্রকল্প যে দেশটি বানাচ্ছে, সেই রাশিয়ার একটি সংবাদমাধ্যম থেকে।

চেটিরটোগো ভালভ খারাপ বেরোনোর পর সেই ভালভ বদলানোর কথা এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড ঘোষণা করে। তবে কবের মধ্যে সমস্যা মিটবে, সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। সঠিক সমস্যাটা যে ঠিক কী তাও বলা হয়নি। ১৯ এপ্রিল এইআরবি জানায়, ‘কয়েক হাজার ভালভের মধ্যে ৪টি ভালভ টেস্টিং-এর সময় খারাপ বেরিয়েছে। সেগুলি প্রতিস্থাপিত করার দায়িত্বে রয়েছে এনপিসিআইএল। সেগুলি প্রতিস্থাপিত হলে, ফের একবার টেস্টিং হবে। তাতে সন্তুষ্ট হলে তবেই নিয়ন্ত্রক সংস্থা ছাড়পত্র দেবে’। স্পষ্টতই ‘কয়েক হাজার ভালভের মধ্যে চারটি ভালভ’ কথাটা বলার মধ্যেই রয়েছে, এই ঘটনাটিকে ছোটো করে দেখানো। সবাই জানে পরমাণু চুল্লিতে ওই একটি দুটি যন্ত্রাংশ খারাপ হলেই ভয়ানক বিপর্যয় ঘটে যায়। কী খারাপ হয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এইআরবি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোপালাকৃষ্ণন, ১৯ এপ্রিল ‘দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে। তিনি বলেছেন, ‘২০১০ সালে এই প্রকল্প কমিশনিং হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও তার টেস্টিং-ই হয়ে ওঠেনি। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জির সেক্রেটারি জানান, তিনি নিশ্চিত, এই মাসের মধ্যেই কমিশনিং হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি ...’

‘... কুদানকুলামের ১নং চুল্লির সাইট থেকে যেটুকু খবর বাইরে আসছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, হাইড্রোঅ্যাকুমুলেটর সিস্টেম স্টেজ ২, অর্থাৎ আপাতনিষ্ক্রিয় দীর্ঘকালীন কোর ধোয়ার বন্দোবস্ত (passive long-term core flooding system) – এর বিশেষ চেক ভালভগুলি, যেগুলি রাশিয়ার বানানো, দেখা গেছে খারাপ। এই শেষ মুহূর্তে সেগুলি বানানোর বরাত দেওয়া হয়েছে হায়দ্রাবাদের এক বিখ্যাত কোম্পানিকে। নয়া রাশিয়ান ভালভগুলিতে চিড় ধরেছে এই প্রাথমিক পর্যায়ের কমিশনিং টেস্টের সময়ই। একইভাবে আপাতনিষ্ক্রিয় তাপ দূরীকরণ বন্দোবস্ত (passive heat removal system) ঠিকঠাক কাজ করছে না। কারণ ড্যাম্পার-এয়ার হিট এক্সচেঞ্জার-ভেন সিস্টেম একসাথে জুড়ে রাশিয়াতে টেস্টিং করার কথা ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি সেখানে। এখানে আনার পর দেখা যাচ্ছে, তা ঠিকঠাক কাজ করছে না। আরও অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু এইগুলির জন্যই আটকে রয়েছে কমিশনিং। এইসব পার্টস-ই সরবরাহ করেছে রাশিয়ার জিও-পোডলস্ক সংস্থা (যার ডিরেক্টর সেরজেই সুতোভ ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুর্নীতি এবং নিচুমানের মাল পরমাণু চুল্লিগুলিতে সাপ্লাইয়ের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছে রাশিয়ায়)।’

অ্যান্টনি কেবিস্টন ফার্নান্ডোর তোলা ইদিনথাকারাই-এর সাম্প্রতিক ছবি। রাশিয়ার চের্নোবিলের ১৯৮৬ সালের ভয়ংকরতম পারমাণবিক বিপর্যয়ের স্মরণ দিবস পালন হল ২৬ এপ্রিল ইদিনথাকারাইয়ে।

একবছর আগেই কুদানকুলাম প্রকল্পের কমিশনিং হওয়ার কথা ছিল। রাশিয়ার ওই সংবাদ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক পুতিন ভারত সফরে আসছেন। তার মধ্যেই কমিশনিং করার মরিয়া প্রয়াস নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে ৭৩টি সংস্থা বেআইনি অর্থ বিনিয়োগ স্কিম চালায় বলে অভিযোগ

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৮ এপ্রিল •

কেন্দ্রের কর্পোরেট বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজেশ পাইলট একটি তালিকা পেশ করেছেন সংসদে, ১৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত ৭৩টি কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে বেআইনি অর্থ বিনিয়োগ স্কিম চালানোর অভিযোগ আছে।

ভিবজিওর অ্যালায়েড ইনফ্রা, ভিবজিওর অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ, রোজভ্যালি রিয়েল এস্টেট, রোজভ্যালি ইন্ডাস্ট্রি, সিলভারভ্যালি কমিউনিকেশন, রোজভ্যালি ফুড বেভারেজ, রোজভ্যালি মার্কেটিং, রোজভ্যালি ইনফোটেক, রোজভ্যালি হোটেল ও এন্টারটেনমেন্ট, রোজভ্যালি প্রজেক্ট, রোজভ্যালি পত্রিকা, রোজভ্যালি ফিল্মস, রোজভ্যালি ট্রাভেলস, রোজভ্যালি হাউসিং ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স, রোজভ্যালি এয়ারলাইনস, রোজভ্যালি ফ্যাশনস, রোজভ্যালি রিয়েলকম, মডার্ন ইনভেস্টমেন্ট, ব্র্যান্ড ভ্যালু কমিউনিকেশন, রূপসী বাংলা প্রজেক্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া ও এন্টারটেনমেন্ট, সারদা রিয়েলটি, সারদা প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন, সারদা অ্যাগ্রো ডেভেলপমেন্ট, সারদা বায়োগ্যাস প্রডাকশন, সারদা টুর ও ট্রাভেলস, সারদা অটোমোবাইলস, সারদা কনস্ট্রাকশন, সারদা শপিং মল, সারদা এডুকেশন, সারদা এক্সপোর্ট, আরটিসি প্রপার্টিজ, আরটিসি রিয়েল ট্রেড, যশোদা রিয়েল এস্টেট, গোল্ডমাইন অ্যাগ্রো, গোল্ডমাইন ফুড প্রডাক্ট, টাওয়ার ইনফোটেক, চক্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার, গোল্ড ফিল্ড অ্যাগ্রো, গোল্ডেন লাইফ অ্যাগ্রো, গোল্ডেন পরিবার হোল্ডিং, হ্যালো ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস সেলস, হ্যাপি লাইফ রিয়েলটি, আইকোর ই সার্ভিস, এমপিএস অ্যাকোয়া মেরিন প্রডাক্টস, এমপিএস গ্রিনারি, এমপিএস ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড অ্যাগ্রো রিসার্চ, এমপিএস রিসর্ট ও হোটেল, প্রয়াগ অ্যাগ্রোটেক, প্রয়াগ ইনফোটেক হাইরাইজ, প্রয়াগ ইনফ্রা, প্রয়াগ মাইক্রোফাইনান্স, রাহুল হাইটস, রাহুল হাইরাইজ, রামেল ইন্ডাস্ট্রিজ, সাইন ইন্ডিয়া অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, সিলিকন প্রজেক্টস, সানসাইন অ্যাগ্রো-ইনফ্রা, সানসাইন ইন্ডিয়া ল্যান্ড ডেভেলপার্স, ইউআরও অ্যাগ্রো, ইউআরও অটোটেক, ইউআরও হোটেলস ও রিসর্টস, ইউআরও হাইজেনিক গুডস, ইউআরও ইনফোটেক, ইউআরও ইনফ্রা, ইউআরও লাইফ কেয়ার, ইউআরও ট্রেক্সিম, ইউআরও ওয়াকার্স, বসুন্ধরা রিয়েলকন, বিশ্বামিত্র কনসালটেন্সি, বিশ্বামিত্র মাল্টি ডেভেলপার্স, ওয়ারিস হেলথকেয়ার, ওয়ারিস টেলিকম

সম্পাদকের কথা

এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো দরকার ...

পাকিস্তানের লাহোরের কোট লাখপত জেলে তেইশ বছর ধরে বন্দি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় নাগরিক সর্বজিত সিং। তিনি এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন লাহোরের একটি হাসপাতালে। জেলের মধ্যে তাঁর ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। ভারত থেকে তাঁকে দেখে ফিরে এসে তাঁর পরিবারের সদস্যরা মিডিয়ার কাছে অভিযোগ করেছে, সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর ওপর হামলা হয়েছে, জেল কর্তৃপক্ষই আক্রমণকারীকে জেলে ঢুকতে দিয়েছে।

সর্বজিতের দিদি দলবীর কৌর মিডিয়ার সামনে মুখ খুলেছেন, 'আমি মনে করি এটা ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মিলিত ষড়যন্ত্র। আমরা কাসভ আর আফজল গুরুকে ফাঁসি দিয়েছি, ওরা সর্বজিতকে মারবে।' সর্বজিতের চিকিৎসা ও দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি তুলে তিনি বলেছেন, ভাইকে দেশে ফিরিয়ে আনার সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত যতক্ষণ না সরকার করছে, ততক্ষণ তিনি কিছু খাবেন না। দেশের নাগরিককে বাঁচাতে ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত, দাবি করেছেন দলবীর।

রাষ্ট্রনীতি আর কূটনীতির কাছে বন্দির মা-দিদির মানবিক আবেদনের মূল্য কতটুকু? মূল্য যে নেই, তার প্রমাণ, বর্ডার পেরিয়ে আসা মাত্র বিএসএফ সর্বজিতের পরিবারকে হেফাজতে নিয়ে নেয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। রাজনীতির অমানবিক উলঙ্গ চেহারাটি আরেকবার স্পষ্ট হয়ে যায়।

এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়, পুব দিকের সীমান্ত পেরিয়ে, বাংলাদেশের সাভারে চারশো শ্রমিকের কারখানা ধসে তিলে তিলে মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা তরুণ প্রজন্মের গলায়, 'যে রাজনৈতিক কাঠামোটা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেই কাঠামোর কোথাও মানবিকতার কোনো স্থান নেই। এটা একটা খেলা মাত্র, আমরা স্রেফ গুটি। এই কাঠামো যতদিন থাকবে আমাদের এইসব নৈতিক মানবিক দাবি দাওয়ার কোনো স্থান নেই।

সারা পৃথিবী জুড়েই রাজনীতি-কাঠামো আজ ভীষণ অমানবিক। কর্পোরেট স্ট্রাকচার আর ওয়ার ইকনমিকসের জটিল কুটিল চালে মানুষের কোনো জায়গা নেই।

এই কথাটাই ভাবছি, এমন একটা রাজনৈতিক কাঠামো দরকার, চিন্তা দরকার, শক্তি দরকার যার ভিত্তি হবে মানবিকতা। মানুষকে ভালোবাসার শক্তির ওপর গড়ে উঠবে একটা সমাজ। দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিদের গলা দিয়ে ভাত নামবে না যখন শাহীনারা অর্ধমৃত অবস্থায় আটকে থাকবে ...।'

চিরাচরিত এবং ব্যবসায়িক চিট — তফাত কী?

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৯ এপ্রিল •

১৯৭১ সালে ভারতের ব্যাঙ্কিং কমিশনের নিযুক্ত একটি স্টাডি গ্রুপ নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিস নিয়ে এক রিপোর্ট তৈরি করে। সেখানে চিট ফান্ড নিয়ে বলা আছে —

'চিট ফান্ড হয়ত বা ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরোনো নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ ভারতের গ্রামগুলিতে শতাধিক বছর আগে চিট্টি, কুরি বা চিট ফান্ডের খোঁজ পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে জমা রাখত লোকে। তারপর যখন অনেকটা শস্য এভাবে জমা হয়ে গেছে তখন তা ফেরত নেওয়া হত। যার দরকার সে লটারির মাধ্যমে অনেকটা শস্য ধার হিসেবে পেত। চিট কথাটার মধ্যেই এই ব্যবস্থার সূত্র লুকিয়ে আছে। চিট মানে হল একটি লিখিত নোট। চিটের বিজেতা যেহেতু লটারির মাধ্যমে ঠিক হত, তাই তা করার জন্য আলাদা আলাদা কাগজে সব সদস্যের নাম লেখা হত, যেমন লেখা হয় লটারিতে। এই ব্যবস্থাটি তাই চিট ফান্ড হিসেবে খ্যাতি পায়। মালয়ালম ভাষায় এই চিটের সমার্থক শব্দ কুরিপ্পু, তার থেকে এসেছে কুরি। বিশ্বস্ত ব্যক্তি — যার কাছে জমা রাখা হচ্ছে ফসলাদি, তার সততার ওপর ভর করে আরও বেশি বেশি লোক তার কাছেই জমা রাখত। প্রথম দিকে যখন আধুনিক ব্যাঙ্কিং মানুষের কাছে পৌঁছায়নি, চিট ফান্ড তখন খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। সমবায়িক উদ্যোগে সঞ্চিত অর্থ ধাপে ধাপে জমা করা এবং সেই সঞ্চিত অর্থ থেকে যার প্রয়োজন তাকে ধার দেওয়া এবং সেই ধার ধাপে ধাপে ফেরত নেওয়া — গ্রামে উদ্ভব হওয়া এই ব্যবস্থা সময়ের সাথে সাথে, বাণিজ্য এবং শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে এবং শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাগরিক জীবনেও চলে আসে।'

ওই একই রিপোর্টে ব্যবসায়িক চিট বা প্রাইজ চিটের কথাও পাওয়া যায় —

'এই ক্ষেত্রে একজন প্রোমোটার, যাকে ফোরম্যান বলে ডাকা হয়, সে বেশ কিছু গ্রাহককে নথিভুক্ত করে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। প্রতিটি গ্রাহককে নিয়মিত ইনস্টলমেন্টে তার প্রদেয় টাকা দিয়ে দিতে হয় ফোরম্যানকে। ফোরম্যান তার এই কাজের জন্য কমিশন নেয়, কিছু রাজ্যে এই কমিশনের পরিমাণ আইন করে ঠিক করে দেওয়া আছে। সেই ফোরম্যানের আরও অধিকার থাকে, প্রথম বা দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্টের টাকা পুরোটাই প্রাইজ হিসেবে নিজে নিয়ে নেওয়ার। যারা প্রাইজ পেল না, তাদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার জন্য অনেক সময় একটা পরিমাণ টাকা সরিয়ে রাখার কথাও চুক্তিতে বলা থাকে। এসব বাদ যাবার পর বাকিটা নিলামে তোলা হয় (একদম শেষ ইনস্টলমেন্টটা বাদ দিয়ে)। যে সেই টাকা ধার হিসেবে নিয়ে, তার ওপর সবচেয়ে বেশি সুদ দিয়ে শোধ দেবে বলে নিলামে ডাক দেয়, তাকে সেই টাকা পুরস্কার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয়। এই বাড়তি টাকা বা সুদটি, হয় সমস্ত সদস্যের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়, অথবা যারা প্রাইজ পায়নি, তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় ডিভিডেন্ড হিসেবে। কিছু কিছু রাজ্যে এই সুদের সর্বোচ্চ সীমা বলে দেওয়া আছে আইন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি একাধিক লোক সম পরিমাণ সুদ দিতে চায়, বা কোনো দর হাঁকার লোক না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে এই পুরস্কারটি তখনকার মতো কে পাবে তা ঠিক করা হয়। একটা চিটে যতজন গ্রাহক, ততগুলির ইনস্টলমেন্ট, যাতে প্রত্যেকে একবার করে পুরস্কারের অর্থ জিতে নেওয়ার সুযোগ পায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু নিলাম হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিলাম ও লটারি দুটোই হয়। পুরস্কার বিজেতা সেই পুরস্কারের টাকা তখনই পাবে, যখন সে একটা পরিমাণ টাকা ফোরম্যানের কাছে জমা রাখে, নিরাপত্তার খাতিরে। যদি কোনো পুরস্কার পাওয়া সদস্য নির্দিষ্ট দিনে ইনস্টলমেন্টের টাকা শোধ না দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তার শাস্তি হয় বিভিন্নভাবে, তার ডিভিডেন্ডগুলি বাজেয়াপ্ত করে বা আর্থিক জরিমানার মাধ্যমে। এগুলি একটি বিজনেস চিটের আবশ্যক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর বিভিন্ন ধরন আছে।'

১৯৭৮ সালের কেন্দ্রীয় আইনে প্রাইজ চিট ও অর্থ সঞ্চালনা স্কিম নিষিদ্ধ, এগুলির বিজ্ঞাপন-প্রচারকারী মিডিয়া বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৮ এপ্রিল •

কেন্দ্রীয় সরকারের চিট ফান্ড নিয়ে দুটি আইন আছে। একটি হল ১৯৭৮ সালের প্রাইজ চিট ও অর্থ সঞ্চালনা স্কিম নিষিদ্ধকরণ আইন, অপরটি হল চিট আইন ১৯৮২। এর মধ্যে ১৯৭৮ সালের আইনে সরকারি ছাড়া অন্যান্য প্রাইজ চিট নিষিদ্ধ, একথা সরাসরি বলা আছে। এমনকী এই আইনে প্রাইজ চিট বা অর্থ সঞ্চালনা স্কিমের বিজ্ঞাপন যদি কোনো প্রকাশনা বা মিডিয়া ছাপে, তবে সেই প্রকাশনা বা সংবাদপত্রকে বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া আছে রাজ্য সরকারকে। পশ্চিমবঙ্গে আনন্দবাজার, বর্তমান থেকে শুরু করে প্রায় সবকটি বড়ো দৈনিক প্রিন্ট মিডিয়া এবং এবিপি /স্টার আনন্দ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রায় সমস্ত টিভি চ্যানেল একাধিকবার বেআইনি বলে অভিযুক্ত ৭৩ টি অর্থ লগ্নী সংস্থাগুলির মধ্যে একাধিক সংস্থার বিজ্ঞাপন ছেপেছে। ১৯৭৮ সালের আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার চাইলে সেগুলিকেও বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

১৯৭৮ সালের আইনে প্রাইজ চিট এবং মানি সার্কুলেশন স্কিম থেকে চিরাচরিত চিট-কে আলাদা করা হয়েছে। চিরাচরিত চিট-এ কয়েকজন মিলে টাকা জমিয়ে নিজেদের মধ্যে সেই টাকা বেশি-কম ভাগ-বাঁটোয়ারা করা যায়, ওই ভাগ বাঁটোয়ারা পরিচালনা করার জন্য কিছু কমিশনপ্রাপ্ত লোকও থাকতে পারে। আর প্রাইজ চিটে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি প্রোমোটার বা দালাল হিসেবে আসে, ওই চিরাচরিত চিটের সুবিধার কথা বলে গ্রাহক বানিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা তোলে, এবং নির্দিষ্ট সময় পরে কিছু গ্রাহককে সুদ বা প্রাইজ দেয়, আর অন্য একটি অংশের গ্রাহককে কেবল তার আসল জমাটা ফেরত দেয়, কোনো সুদ বা প্রাইজ দেয় না। সোজা কথায় চিটের নামে সে নিজের অস্বাভাবিক রোজগারের ফন্দি করে। ১৯৭৮ সালের আইনে চিরাচরিত চিট নিয়ে কিছু না বলা হলেও, প্রাইজ চিট এবং অর্থ সঞ্চালনা স্কিম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

আপাতত এই আইনে কী কী আছে তা একবার দেখা যাক। মনে রাখা দরকার, সম্প্রতি ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডি সুব্বারাও প্রকাশ্যে বলেছেন, '১৯৭৮ সালের চিট আইনে অর্থ সঞ্চালনা স্কিম নিষিদ্ধ। যদি রাজ্য সরকারগুলি চায় এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তবে রাজ্য সরকারের এই আইনের বলে পূর্ণ ক্ষমতা আছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের 'দ্য প্রাইজ চিট অ্যান্ড মানি সার্কুলেশন স্কিমস (ব্যানিং) অ্যাক্ট, ১৯৭৮' নামক আইনের ২ নং ধারায় চিট-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে : 'কনভেনশনাল চিট' বা চিরাচরিত চিট, যাকে চিট, চিট ফান্ড, কুরি বা অন্য কোনো নামে ডাকা হয়, তাতে একজন অন্য কিছু লোকের সঙ্গে মিলে একটা বোঝাপড়ায় আসে, যাতে প্রত্যেকে একটা পরিমাণ টাকা দেবে (বা দানাশস্য দেবে) ইনস্টলমেন্টে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। বিনিময়ে এই প্রত্যেক গ্রাহক টেন্ডার বা নিলাম বা লটারি অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে সুযোগ পাবে মোট জমার মধ্যে থেকে একটা পরিমাণ পুরস্কার অর্থ (প্রাইজ অ্যামাউন্ট) পাবার এবং ওই অর্থ তার প্রদেয় ইনস্টলমেন্ট থেকে বিয়োগ হবে।

'মানি সার্কুলেশন স্কিম' (অর্থ সঞ্চালনা স্কিম) মানে হল কোনো স্কিম, তা সে যে নামেরই হোক না কেন, তাতে সহজে অর্থ আমদানির কথা বলা আছে। অথবা কোনো অর্থ বা মূল্যবান জিনিসপত্রাদি রেখে সদস্য হয়ে, তারপর আরও কিছু সদস্য তৈরি করতে পারলে অনেক বেশি অর্থ আমদানির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তা সে অর্থ ওই নতুন হওয়া সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির টাকা বা ইনস্টলমেন্ট থেকে আসুক বা না আসুক।

'প্রাইজ চিট' মানে হল, কোনো একজন প্রোমোটার, ফোরম্যান বা এজেন্ট বা যাই হোক, সে কোনো বন্দোবস্তের মাধ্যমে অন্যদের কাছ থেকে একলপ্তে অনেকটা টাকা বা ইনস্টলমেন্টে টাকা তুলে তার পুরোটা বা একটা অংশ বিনিয়োগ করবে, লটারি বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে তা অন্য কিছু গ্রাহকের মধ্যে প্রাইজ হিসেবে বন্টন করবে, বা নির্দিষ্ট সময় শেষে কিছু বোনাস বা প্রিমিয়াম বা ইন্টারেস্ট দেবে। আর যারা এই প্রাইজ পেল না, সেইসব গ্রাহকদের কোনো সুদ বা প্রাইজ কিছুই দেবে না, শুধু আসল বা তার কিছু ইনস্টলমেন্ট ফেরত দেবে।

আইনের ৩ নং এবং ৪ নং ধারায় বলা আছে, এই প্রাইজ চিট বা মানি সার্কুলেশন স্কিম-এ সদস্য বা অংশগ্রহণকারী হিসেবে ঢোকা নিষিদ্ধ। কেউ প্রাইজ চিট বা মানি সার্কুলেশন স্কিমের প্রচার করতে পারবে না। অন্যথায় তার, তিন বছর পর্যন্ত জেল বা/এবং পাঁচ হাজার টাকা অবধি জরিমানা হতে পারে। এই সাজা কখনোই একবছরের কম বা এক হাজার টাকার কম হবে না।

আইনের ৫ নং ধারায় বলা আছে, কেউ এই প্রাইজ চিট বা মানি সার্কুলেশন স্কিমের সঙ্গে জড়িত থেকে টিকিট, কুপন বা অন্যান্য তথ্যাদি ছাপালে, বিজ্ঞাপিত করলে বা করার চেষ্টা করলে বা অন্য কাউকে দিয়ে এসব করালে বা সহায়তা করলে ২ বছর পর্যন্ত জেল বা/এবং ২ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

আইনের ৬ নং ধারায় বলা আছে, কোনো কোম্পানি যদি এই অপরাধ করে, তাহলে সেই কোম্পানির যারা এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের এবং কোম্পানিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

আইনের ৭ নং ধারায় বলা আছে, এই অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তল্লাশি চালানো এবং বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা রয়েছে থানার ওসির বা রাজ্য সরকারের নিযুক্ত অফিসারের, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে। গ্রেপ্তারি এবং তথ্যাদি বাজেয়াপ্ত করতেও পারে।

আইনের ৮ নং ধারায় বলা আছে, প্রাইজ চিট বা মানি সার্কুলেশন স্কিমের প্রকাশনা বা সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি কোনো সংবাদপত্র বা অন্যান্য প্রকাশনা এই প্রাইজ চিট বা মানি সার্কুলেশন স্কিমকে প্রোমোট করে কোনো কিছু ছাপে, বিজ্ঞাপন ছাপে — তবে রাজ্য সরকার অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই সংবাদপত্রটিকে বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

আইনের ৯ নং ধারায় বলা আছে, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এই অপরাধের বিচার হবে।

আইনের ১১ নং ধারায় বলা আছে, কিছু প্রাইজ চিট বা মানি সার্কুলেশন স্কিমের জন্য এই আইন প্রযোজ্য নয় : রাজ্য সরকার, রাজ্য সরকারের কোনো দফতর, রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন কোনো কোম্পানি যারা কেবল চিটের ব্যবসাই করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বীকৃত কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, রাজ্য সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বীকৃত কোনো দাতব্য সংস্থা বা শিক্ষামূলক সংস্থা।

আইনের ১২ নং ধারায় বলা আছে, এই আইন চালুর সময় কেউ যদি কোনো চিট চালায়, তাহলে রাজ্য সরকার তাকে গুটিয়ে ফেলার জন্য সর্বোচ্চ দু-বছর সময় দিতে পারে।

আইনের ১৩ নং ধারায় বলা আছে, রাজ্য সরকার প্রয়োজনে এই আইন লাগু করার জন্য নিয়ম তৈরি করতে পারে।

মানি মার্কেটের ওপর কড়া নজরদারি হোক

আকাশ মজুমদার, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল •

অবশেষে যা ঘটার তাই ঘটল। সারদা গোষ্ঠীর দ্বারা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষ একরাতে সর্বস্বান্ত হল। আর তা ছাড়া নাকি উপায়ও নেই। কারণ কারোর কিছু করবার নেই। নাকি কেউ কিছু করতে চায় না?

বাবা-মার কাছে শুনেছি, তাঁদের সময় থেকে এই লুঠ চলছে। এর আগেও বেশ কিছু কোম্পানি, ওভারল্যান্ড, সঞ্চয়িতা এরকমভাবে মার্কেট থেকে প্রচুর টাকা তুলে পালিয়েছে। তারপরেও ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সুরক্ষিত করার কোনো ব্যবস্থা হল না। কারণটা কী? বিগত যত বছর ধরে এই লুঠ চলছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রচুর সময় ছিল ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আমানত সুরক্ষিত করার, কিছু করার। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে কিছুই হয়নি। আসলে চূড়ান্ত উদাসীনতা। এই গরিব ক্ষুদ্র আমানতকারীদের টাকা সুরক্ষিত থাকল কিনা, তাতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের, না কোনো রাজনৈতিক দলের, না কোনো কর্পোরেট মিডিয়ার কারোর কোনো মাথা ব্যথা নেই। যদি থাকত, তবে এতদিন ধরে এই লুঠ চলত না। বরঞ্চ এরা বিভিন্নভাবে এই চিটফান্ডগুলির টাকায় পুষ্ট। তাই জন্যই এদের এত বাড়বাড়ন্ত।

কয়েকজন উঁচু র‍্যাঙ্কের এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, নিয়মিত ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে বা উঁচু পদ দিয়ে কিছু রাজনৈতিক দাদাদের হাতে রাখা হয়। একইভাবে প্রশাসনের নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুষ দেওয়া হয় এবং ছোটো বড়ো কর্পোরেট মিডিয়াতে রেগুলার বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের হাতে রাখা হয়। তবে তোমার চিটফান্ড কোম্পানি নিশ্চিন্তে চলবে। কেউ তোমার পেছনে লাগবে না। যদি কোনো অসুবিধা হয়, এরাই তা দেখে নেবে। বাকি আমানতকারীর টাকা দেওয়া নিয়ে অত চিন্তা না করলেও চলবে। এভাবে মার্কেট থেকে বিশাল পরিমাণ টাকা উঠে গেলে, হঠাৎ একদিন ঝাঁপ ফেলে দেওয়া।

এই মানি মার্কেটে পশ্চিমবঙ্গে শয়ে শয়ে কোম্পানি আছে। প্রত্যেকের এজেন্ট অন্য কোম্পানির নামে বলে, সে ভাঁওতাবাজ। আর সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্য এরা এজেন্টদের ফাইলের মধ্যে দরকারে কমার্স ক্লাসের বইয়ের পাতা পর্যন্ত গুঁজে দেয়। কেউ বলে, আমাদের সরকারের কাছে টাকা জমা রাখা আছে, যেগুলোর পোশাকি নাম সিকিওরড ডিবেঞ্চার বা প্রেফারেন্সিয়াল ডিবেঞ্চার, অতএব টাকা মার যাবার কোনো ভয় নেই। কিন্তু হয়তো সরকারের কাছে যে টাকা রেখেছে, তার কয়েকগুণ তুলল। কেউ দেখার নেই। কোম্পানিগুলোর ভেতরের খটোমটো কথা বোঝার সাধ্য এমনকী বাঘা বাঘা এজেন্টদেরও থাকে না। সাধারণ আমানতকারী তো দূরস্থান। সাধারণ ক্ষুদ্র আমানতকারী এজেন্ট চেনে, কোম্পানি চেনে না।

সবাই বলে, আমাদের কোম্পানি অ্যাসেট ভিত্তিক। জমি, শিল্প সব আছে। টাকা মার যাবে না। কিন্তু কে তা নজরদারি করবে? আমাকে একবার একটা কোম্পানি নিয়ে গেছিল জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহারে, তাদের প্রজেক্ট দেখাতে। যাতে আমি তাদের বিশ্বাস করি। কোচবিহারের নাককাটা বিলে আট কিলোমিটার জুড়ে আমাকে দেখাল ফিশারি প্রজেক্ট। এবার ওই ফিশারি কত বছরের জন্য লিজ নেওয়া, কী কী শর্তে লিজ নেওয়া, তা কে জানবে? কেউ কেউ রাস্তার পাশে জমি দেখায়, শপিং মল দেখায়, নার্সিং হোম দেখায়। একটা বিশাল জমিতে প্ল্যাকার্ড লাগানো। কিন্তু এগুলোর তথ্য কী? কোথায় গেলে তার তথ্য পাওয়া যাবে? সরকারের উচিত এইসব নজরদারির বন্দোবস্ত করা।

অনেকে আবার বকলমে এনজিও-র নামে চিটফান্ড চালায়, টাকা নিজে তোলে না। যেমন আমি অ্যালকেমিস্ট নামে একটা সংস্থার কথা জানি, যারা নিজেরা টাকা তোলে না আমাদের এখানে।

আর তাছাড়া সরকারি নেতা, আমলা, পুলিশকর্তাদের দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বাস অর্জন করা তো আছেই। এখন সব মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি। মিডিয়ায় বারবার বিজ্ঞাপন দিলে তার প্রভাব কিন্তু মানুষের ওপর পড়বেই। লোকে সেগুলোকে সত্য বলে ভাবে। অনেক বড়ো বড়ো এজেন্টের সঙ্গে কথা বলেও আমি এই মানি মার্কেট কোম্পানিগুলির হিসেবের তল পাইনি।

লোকে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসে না গিয়ে এই সব মানি মার্কেট কোম্পানিতে টাকা রাখে। একটা বড়ো কারণ তো, এই সব মানি মার্কেট কোম্পানিতে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের মতো অ্যাকাউন্ট খোলা এসবের হ্যাপা নেই। এজেন্টরা বাড়ি বয়ে এসে টাকা দিয়ে যায়, নিয়ে যায়। আর একটা বড়ো কারণ সুদের হার। অনেকেই মনে করে, সরকার যা সুদ দেয় তা কম। একথার যথেষ্ট যুক্তি আছে। পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, এলআইসি যা সুদ দেয়, তা এমনকী বাৎসরিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়েও কম। অর্থাৎ, আমি যদি টাকা জমাই, তাহলে সেই আসলটিই কমে যায় আসলে। অর্থাৎ আমার আমানতের লাভটি ভোগ করে ব্যাঙ্ক বা ওইসব প্রতিষ্ঠানগুলো। সেখানে মানি মার্কেট অনেক বেশি সুদ দেয়। অনেকের মতে, আমানতের সঠিক ফেরত পাওয়া যায় কেবল মানি মার্কেটে টাকা রাখলে।

আমার মনে হয়, মানি মার্কেট বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। আমানতের ওপর ন্যায্য আয়ের অধিকার ছোটো বড়ো সবার আছে। কিন্তু যাতে আমানতকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য সমস্ত বিষয়ে কড়া সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা জরুরি।

জনাকীর্ণ বড়তলায় একটাও জনশৌচাগার নেই

২৫ এপ্রিল, শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন

মেটিয়াব্রুজের বড়তলা ক্রমবর্ধিষ্ণু এক ব্যবসাকেন্দ্র। অজস্র কাপড়ের দোকান, জোগাড়, মাছ–মাংস–সবজির দোকান, স্টেশনারি–বইয়ের দোকান, কনফেকশনারি আইটেম প্রভৃতি হরেকরকম দোকানপসারে বড়তলা নিত্য জমজমাট। হাজার হাজার ক্রেতা–বিক্রেতার আগমনে, রকমারি জিনিসের আদানপ্রদানে, লোকে লোকারণ্যে দিনেরবেলায় অতি ব্যস্ত বড়োবাজারের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়। এর ওপর রয়েছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চাপ। ফলে কোলাহলে, মানুষের সরগরমে বড়তলা অঞ্চলে (বুধবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার, রবিবার ও সোমবার) তিলধারণের জায়গাটুকু থাকে না। এইরকম একটি অঞ্চলে সুলভ শৌচাগার নেই, একথা এই যুগে বসে কি ভাবা যায়? একদা বড়তলার আগাম অগ্রগতির কথা অনুধাবন করে বহু পূর্বে রাস্তার সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল, সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাস্তার দুধারের দোকানঘরগুলিকে, জনগণকে এই বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, বড়তলায় আধুনিক সুযোগ–সুবিধা সম্পন্ন সুপার মার্কেট, সবজি–মাছ–মাংসের দোকান, ব্যাঙ্ক পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক কাজ হিসেবে রাস্তার সংস্কার করা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই সুপার মার্কেট, ব্যাঙ্ক পরিষেবা? দোকানদারদের পুনর্বাসন হিসেবে ছোটো ছোটো দোকানঘর দেওয়া হল। কিন্তু তাদের প্রাতঃকৃত্যের কোনো শৌচাগার গড়ে তোলা হল না, হাজার হাজার পথচলতি মানুষ, ক্রেতা–বিক্রেতা বাথরুম করার জন্য কখনো ছুটে যায় স্কুলে, আবার কখনো কাপড়ের মার্কেটগুলিতে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও মার্কেটওয়ালাদের আপত্তিতে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ বড়তলার বর্তমান বাজারের মালিকদের সঙ্গে রফা করে পুরসভা আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত সুপার মার্কেট, উন্নতমানের সুলভ শৌচাগার গড়ে তুলতেই পারে। কিন্তু সেই চেষ্টা আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আসলে তাদের সদিচ্ছা নেই।

একটু দূরে আকড়া ফটকে দু–দুটি সুলভ শৌচাগার গড়ে তোলা হয়েছে মহেশতলা পুরসভা ও কলকাতা কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে। তাহলে বড়তলার বেলায় এত বঞ্চনা কেন? এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে। পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্যসচেতনতা নিয়ে বড়ো বড়ো বুলি আউড়ানো হয়। অথচ এই জনাকীর্ণ বাজারে একটা সুলভ শৌচাগার নেই। এ থেকেই কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বলে পথচলতি মানুষের ধারণা। স্থানীয় কাউন্সিলার, বিধায়ক এবং এলাকার নেতা–নেত্রীরা এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব। জনৈক পথচারী বললেন, এদের ভোটে জেতানোয় আমাদের কাজ, অথচ আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই। তাই বড়তলা অঞ্চলের মানুষের কপালে জুটেছে বঞ্চনা, বঞ্চনা আর শুধুই বঞ্চনা।

এইডস আক্রান্তদের সমাবেশ কলকাতায়, আট দফা দাবি

সোমনাথ হোড় রায়, কলকাতা ২১ এপ্রিল •

দূর দূরান্ত থেকে ওরা এসেছে হাতে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানার নিয়ে মিছিল করে ৮ দফা দাবি নিয়ে। ২০ থেকে ৪০ বছরের এক হাজারের বেশি পুরুষ মহিলা, সঙ্গে কিছু বাচ্চাও আছে, যাদের বয়স দশ থেকে বারো। এরা সকলে এইচআইভি এইডস আক্রান্ত। এইডস নিয়ে তারা বেঁচে আছে চিকিৎসার অবহেলায়। এই রোগ সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভীতি ও আতঙ্ক আছে, তার জেরে এদের অবজ্ঞা করা, এদের সংস্রব এড়িয়ে চলার মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে, কুষ্ঠ রোগীদের মতো অভিশপ্ত জীবন নিয়ে, অস্পৃশ্য হয়ে এরা বেঁচে থাকে। এরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা এদের চিকিৎসা করতে চায় না। কোনো কারণ, অজুহাত দেখিয়ে এদের উপেক্ষা করা হয়। অথচ সংক্রামক রোগ বলতে যা বোঝায়, এইচআইভি এইডস সেরকম কোনো সংক্রামক রোগ নয়।

এইডস রোগী যারা এসেছিল, তাদের দেখলে বোঝার উপায়ই নেই যে তারা আক্রান্ত। বেশভূষা, পোশাক পরিচ্ছদ, শ্রী–সৌষ্ঠব অন্যান্য সব স্বাভাবিক মানুষের মতো। ওরা এসেছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলা এবং উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে দল বেঁধে, মিছিল করে, বৈশাখের নিদাঘ দিনে। সেদিন ২০ এপ্রিল রোদের তেজ একটু কম ছিল, তাপমাত্রা ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। ওরা জড়ো হয়েছিল কলকাতার ধর্মতলার এসপ্ল্যানেড ইস্টের ট্রাম টার্মিনাসে — রানি রাসমণি রোড থেকে সমাবেশের স্থান পরিবর্তিত হওয়ায়। সকাল দশটা থেকে ওরা এসে উপস্থিত হতে শুরু করে। প্রথম থেকেই পাঁচটি দাবি ছিল : ১) সংসদে এইচআইভি বিল পেশ করতে হবে ২) প্রতিবন্ধীদের মতো চিকিৎসার জন্য ট্রেনে, ট্রামে, বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য পাসবই দিতে হবে। ৩) প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে এই এইডস আক্রান্তদের প্যাথলজিকাল পরীক্ষা সহ অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, বিনামূল্যে ওষুধ দিতে হবে। ৪) প্রতিটি এইচআইভি আক্রান্ত মানুষকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করতে হবে। ৫) এইচআইভি আক্রান্ত অনাথ শিশুদের শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সরকারি হোমে করতে হবে। এই পাঁচটি দাবির সাথে নতুন তিনটি দাবি যোগ হয়েছে, ৬) সরকারি সংস্থাগুলিতে এদের সংরক্ষণ দিতে হবে। ৭) অন্যান্য বেকারদের মতো এইচআইভি আক্রান্তদের বেকার ভাতা দিতে হবে। ৮) এইচআইভি আক্রান্ত শিশু মহিলা পুরুষ সবাইকে বিনামূল্যে রেশন দিতে হবে।

২০০৪ সালে ওদের এই সংগঠন 'বেঙ্গল নেটওয়ার্ক অফ পিপলস লিভিং উইথ এইচআইভি এইডস' গড়ে ওঠে। তারপর থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই দাবি নিয়ে ওরা চারবার সমবেত হল। ওদের সমাবেশে অনেককে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেউ আসেনি বা আসতে পারেনি, এই রাজ্যের এসইউসিআই সাংসদ তরুণ মণ্ডল ছাড়া। তরুণ মণ্ডল তাঁর সাংসদ কোটায় পাওয়া টাকা থেকে ওদের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে হোম–আবাসন তৈরি করে দিচ্ছেন। ওদের জন্য সংসদের ভেতরে ও বাইরে লড়াইও করছেন বলে জানালেন।

শাহবাগ আন্দোলনের বিষয়ে মেদিনীপুরের মানুষ প্রায় জানেই না

কামরুজ্জামান খান, মেচেদা, ৩০ এপ্রিল •

আমি মেদিনীপুরের মেচেদা, তমলুক ও পাঁশকুড়ার বিভিন্ন ধরনের ৬০–৭০ জন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, বেশিরভাগই মুসলিম। দেখেছি, তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষ শাহবাগ নিয়ে কিছু জানেই না। আর কুড়ি শতাংশ মানুষ শাহবাগ আন্দোলনটা জানে। তার মধ্যে দশ শতাংশ মানুষ মনে করে, ওটা বাংলাদেশের ব্যাপার। দু–তিন শতাংশ মানুষ আন্দোলন নিয়ে কিছু বলতে চায়নি। এক শতাংশ মানুষ মনে করে, ওটা বাঙালদের আন্দোলন। তিন শতাংশ মানুষ বলে যে, এটা একটা আন্দোলন যা একটা জাতি, একটা দেশ এবং বিশ্বকে প্রভাবিত করে আর অনেককিছুর পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে। আর চার শতাংশ মুসলিম মনে করে, শাহবাগের পক্ষে যে বাঙালিয়ানার সুড়সুড়ি দিয়ে মিটিং মিছিল হচ্ছে, তা মুসলিম বিরোধী এবং বাঙালি বিরোধীও বটে।

এই অংশের এরকম মনে করার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। সেটাকে এক জায়গায় করলে যা দাঁড়ায় : পৃথিবীতে আমেরিকার বুশ প্রশাসন থেকে শুরু করে ওবামা পর্যন্ত কত গণতন্ত্র এবং মানবতাবিরোধী কাজ করে চলেছে। কত নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, বিনা দোষে। তারা গোটা পৃথিবীকে লুঠ করে নিচ্ছে তাদের স্বার্থের জন্য। যুদ্ধের দামামা বাজছে প্রতিনিয়ত। তাদের জন্য তো কেউ আন্দোলন করেনি। বুশ ও ওবামার তো আগে বিচার হওয়া উচিত। এদের ফাঁসি চেয়ে তো আগে আন্দোলন করা উচিত। এরা প্রাচীন সভ্যতার উৎস ইরাককে ধ্বংস করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করেছে। আজকের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দ্রোন হামলা করে, প্রতিনিয়ত কত সাধারণ মানুষকে হত্যা করে চলেছে তারা। তার প্রতিবাদ কই? বাঙালি জাতিসত্ত্বা, ভাষাগত আনুগত্য, আমরা গর্বিত বাঙালি, এসব মেকি কথা। কিছুদিন আগে ভারতের আসাম রাজ্যের বোড়োল্যান্ডে বোড়োদের দ্বারা যে বাঙালি খেদাও অভিযান হল, কত বাঙালি মানুষের প্রাণ গেল। কত বাঙালি মানুষ গৃহহারা হল। তার আগে ও পরে মায়ানমারে একের পর এক বাঙালিদের ওপর অত্যাচার শুরু করে সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিছু মানুষ। কত বাঙালির প্রাণ নিল। লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পদ লুঠ করে লক্ষ লক্ষ বাঙালিদের দেশছাড়া করল। তাদের জন্য কই বাংলার রাজপথে কোনো আন্দোলন হয়নি তো! তার বেলায়? তারা শুধু গরিব ও নিরীহ বাঙালি মুসলমান বলে? যারা শাহবাগ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে কলকাতায়, তারা গোটা বাঙালির নয়, তারা কোনো এক শ্রেণীর হয়ে মিটিং মিছিল করছে। তাদের পুরো বাঙালি জাতির অভিভাবক হওয়ার মতো নিরপেক্ষতার সাহস নেই ...।

সওয়ালের জায়গা নেই, গায়ে আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে গুজরাতের মানুষ

সৌম্য বসু, ২৯ এপ্রিল, তথ্যসূত্র বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা •

গত ৪ এপ্রিল গুজরাতের রাজকোটে এক নেপালি পরিবারের ৫ সদস্য রাজকোট পুরসভার সামনে নিজেদের গায়ে আগুন দেয়। পরিবারের তিনজন গিরীশ (২৮), আশা (৩৫) এবং ভারত সরকারি হাসপাতালে মারা যায় ঘটনার দিনই। আর দু–জন বসুমতী এবং রেখা মারা যায় দু–দিন পরে। রাজকোট পুরসভা মৃতদের আত্মীয়কে মৃত প্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। তিনজনকে গ্রেফতারও করা হয় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য। কিন্তু গিরীশ মরবার আগে রাজাভা জালা এবং কমলেশ মিরানি নামে শাসক দল বিজেপির দুই কাউন্সিলরের নাম করে যান, যারা তাদের ভয় দেখিয়ে উৎখাত করার পাণ্ডা, তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর শহর জুড়ে কিছু অশান্তির সৃষ্টি হয়, একটি সরকারি বাস পোড়ানোর খবর পাওয়া গেছে। কংগ্রেস এই ঘটনার নিন্দা করে শহর জুড়ে বন্ধের ডাক দিয়েছে।

ওই নেপালি পরিবারটি ছট্টুনগর হাউসিং সোসাইটির জমিতে গত ৩৫ বছর ধরে বেআইনি ভাবে বসবাস করছিল, এমনকী তারা সেই জমিতে পাকা বাড়ি গড়ে তুলেছিল। পুরসভার নজর অনেকদিন ধরে ওই পরিবারটির ওপর ছিল। জানা গেছে ওই হাউসিং সোসাইটি রাজকোট পুরসভার কাছে তাদের জমি ফেরতের জন্য আবেদন করাতে পুরসভা ওই নেপালি পরিবারকে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিস পাঠায়। কিন্তু ওই নেপালি পরিবার বাসস্থান ছাড়তে নারাজ হয় এবং তাদের ঘর বাঁচাতে তারা কোর্টে আবেদন জানায়। কিন্তু রায় বেরোয় তাদের বিপক্ষে।

ঘটনার দিন কিছু বস্তিবাসী রাজকোট পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল রায়া ধার এলাকার কিছু বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। সেই সময় ওই নেপালি পরিবারের পাঁচ সদস্য সেইখানে যায় এবং ভিড়ের মধ্যে কেরোসিন ঢেলে নিজেদের গায় আগুন লাগায়। পুরসভার কমিশনার অজয় ভাদু বলেছেন যে, ওই পরিবারের আর্থিক অবস্থা দেখে তাদের বলা হয়েছিল তারা যেন তাদের বাড়ি ভেঙে ফেলে। তিনি এও বলেছেন যে ওই পরিবার যদি তাদের দ্বারস্থ হত, তাহলে হয়তো এই মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো যেত। কিন্তু জানা গেছে যে ওই পরিবারটি একাধিক বার পুরসভার দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ২২ এপ্রিল হরিশ রামানি (৬২) নামে এক ব্যক্তি একই ভাবে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাসময়ে চিকিৎসা হওয়াতে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, ৫ বছর আগে হরিশ রামানির তিনখানা দোকান রাজকোট পুরসভা ভেঙে দেয় কোনো বিকল্প ছাড়াই, সেই কথা সুইসাইড নোটে উল্লেখ করেছেন হরিশ।

শাহবাগ সংহতির ডাকে কলকাতায় সাধারণ সভা

তমাল ভৌমিক, কলকাতা, ১২ এপ্রিল •

১২ এপ্রিল কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে ইস্ট লাইব্রেরিতে শাহবাগ সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ–র ডাকে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন ইন্দ্রনীল সাহা। সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য জানান। গোটা বক্তব্যটি রেকর্ড করা হয়, তা পাওয়া যাবে শাহবাগ সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ–র ফেসবুক পাতায়।

উত্তর চব্বিশ পরগনার মছলন্দপুরের সুভাষ মল্লিক বলেন, এই আন্দোলন বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকা মুশকিল। আন্দোলনের সমর্থনে এখানে বেশি মানুষ আসছে না। বাংলাদেশে যারা নাস্তিকতা ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন তারা আন্দোলনের পাশে আছে। গ্রামের দিকে মৌলবাদীরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করছে। যারা পালিয়ে আসছে, তাদের শরণার্থী রূপে দেখা হোক।

জে সি পাণ্ডে বলেন, বাংলাদেশে গেছিলাম, শাহবাগে একদিন কাটিয়েছি। বগুড়া, বরিশাল ইত্যাদি জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। জামাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এখানে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

অশোকনগরের পঙ্কজ রায় বলেন, এখানে ও অন্যান্য দেশে মৌলবাদ তোষণ খুব চলছে। মুসলিম দেশে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন করা কঠিন। যদিও ওরা, বিশেষত ছাত্ররা তা করছে। প্রশ্ন হল, আমাদের দেশে কি মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন সম্ভব?

কলকাতার সন্তোষপুর থেকে আগত প্রশান্ত হালদার বলেন, ওখানে কার কী শাস্তি হবে, তা ওদেশের রাষ্ট্র ও জনগণ ঠিক করবে। ওখানে মূল সেন্টিমেন্ট, স্বাধীনভাবে থাকব, কারো ফতোয়া মানব না। এটাই নতুন প্রজন্মের ভাবনা। লড়াইটা শুধু মৌলবাদবিরোধী বললে ছোটো করা হয়। আমাদের দেশে এই আন্দোলন নিয়ে আলাপ–আলোচনা, প্রচার হওয়া দরকার।

উত্তর চব্বিশ পরগনার স্বপন গোস্বামী বলেন, ভাষার আবেগ থেকে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ বাংলাদেশ ছাড়া আর একটিও নেই। লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, অসংখ্য ধর্ষণ হয়েছে। এই বিরাট মূল্যে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস আছে ওখানে। শাহবাগের যে আন্দোলন তাকে সেলাম জানাতে হয়। কারণ ওদেশে বিরুদ্ধ শক্তি খুব প্রবল। আমাদের এখানে যেসব হিন্দুরা দেশভাগের সময় এসেছিল, তাদের সমর্থন করা উচিত ছিল। এখানকার ছাত্র–যুবদের চেতনা বাড়াতে পারে, এমন কর্মসূচি নেওয়া দরকার।

বাঘা যতীনের ধীরাজ বোস বলেন, আমরা আমাদের এলাকায় একটা শাহবাগ সংহতি বানিয়েছি। শাহবাগ আন্দোলনের মৌলিক নির্যাসের সঙ্গে আমরা একমত, যদিও ফাঁসির দাবি অনেকে সমর্থন করে না। অপরাধীদের বিচার হোক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হোক — এই দুই কথা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষে থাকবে না, ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয়' — এই দাবি এখানেও তোলা দরকার।

পূর্ব যাদবপুরের পঞ্চসায়রের অমলেন্দু বলেন, শাহবাগের আন্দোলন মূলত ছিল রাজাকারদের লঘু শাস্তির বিপক্ষে। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে জামাতকে নিষিদ্ধ করার দাবি যুক্ত হয়। এর সঙ্গে মূল কেন্দ্রে থাকে ফাঁসির দাবি। ওই আন্দোলনে রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল, হয়তো ভোটের দিকে তাকিয়ে। পরবর্তীকালে রাজীবের মৃত্যু এবং আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী তকমা দেওয়ার প্রভাব পড়েছে আন্দোলনের ওপর। আন্দোলন তার ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেনি, নামাজের সময় মাইক বন্ধ রাখা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতা দেখা যায় না।

হাওড়ার ডোমজুড়ের সোনালী বলেন, শাহবাগ আন্দোলন বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। ধর্মের ভিত্তি থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভাজন থাকে না। নজরুল জাতীয় কবি হলেও, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। ধর্মের প্রতি সরল বিশ্বাস থাকতে পারে। কিন্তু ভাষার ব্যাপারটা আরও অনেক বড়ো। আমাদের দরকার ছাত্র–যুবদের মধ্যে বাঙালি আবেগটাকে বাড়ানো।

মধ্য কলকাতার শ্যামাঞ্জন শূর বলেন, এখানে সবাই বাঙালি আবেগে এগিয়ে এসেছে, যেমন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হয়েছিল — এটাই আমাকে নাড়া দিয়েছে। ভাষা নিয়ে শুরু হলেও শাহবাগ আন্দোলনকে এখন আওয়ামি লিগ কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের দেশে মানুষ সহজে জাগতে চায় না। আমার মনে হয়, শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে একটি লেখা নিয়ে মানুষের দোরে দোরে যাওয়া দরকার।

জয়নগরের সঞ্জয় ঘোষ বলেন, শাহবাগ আন্দোলনের মূল সুরের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আন্দোলনের একটা সরকার নির্ভরতা আছে, আর সরকার তো জনবিরোধী, এটা আন্দোলনের খারাপ দিক। আন্দোলনের নেতারা অপরিণত ও অদূরদর্শী। ফাঁসির দাবি নিয়ে প্রশ্ন আছে। মৌলবাদ বলে যেটাকে বলা হচ্ছে, সেটা ওখানে কেন শক্তিশালী তা নিয়ে ভাবা দরকার। অর্থনৈতিক দিকটি গুরুত্ব হারাচ্ছে। বাংলাদেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদের যে হস্তক্ষেপ, তাকেও বিবেচনায় আনা দরকার।

মেদিনীপুরের মেচেদার কামরুজ্জান বলেন, আমাদের এলাকায় আমি একটা সমীক্ষা করে দেখেছি, বেশিরভাগ মানুষ শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে জানে না। যারা জানে তাদের মধ্যে একটা অংশ মুসলমান মনে করে, এটা বিদেশিদের টাকায় চলা একটা আন্দোলন। আমরা ধর্ম বাদ দিয়ে ভাষার ভিত্তিতে কি কোনো আন্দোলন করতে পারি? রাজনীতি ও অর্থনীতি সাধারণ মানুষকে কিছু করতে দিচ্ছে না বলে আমার মনে হয়।

শুভপ্রতীম বলেন, আমাদের এখানেও ধর্মনিরপেক্ষ মেলাগুলিতে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি সংগঠিতভাবে আক্রমণ করেছে। তাই আমাদের নিজস্ব সামাজিক পরিসরে মৌলবাদ বিরোধিতার কথা বলা ও কর্মসূচি নেওয়া দরকার।

নদীয়ার হাঁসখালির তাপস বিশ্বাস বলেন, কোনো বাংলাতেই ধর্ম বাদ দিয়ে কোনো আন্দোলন সফল হতে পারবে না। বাংলার ইসলাম আর আরবের ইসলামে তফাত আছে। এখানে তরবারির সাহায্যে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই কোনটা ধর্ম আর কোনটা ধর্ম নয়, তা নিয়ে কথা বলা দরকার। মৌলবাদী বলে যাদের মনে হচ্ছে তাদের সঙ্গেও কথা বলা দরকার, তাদের সম্পদের কত শতাংশ তারা জাকাত দিয়েছে? দুই ধর্মের মৌলবাদী শক্তি ধর্মকে কাজে লাগাচ্ছে ক্ষমতায় আসার জন্য। ধর্মকে মানবতাবাদের পক্ষে কাজে লাগাতে হবে।

হালিশহরের সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মই ধ্বংস করেছে। শাহবাগের আন্দোলন আমাদেরকে ভারতবাসী হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছে। এখানে বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিতরা অমানবিকতা শিখেছে।

অশোকনগরের তুহিন বলেন, শাহবাগের আন্দোলন নিয়ে বলার মতো সম্মান আমাদের নেই। 'ফাঁসির দাবি' সঠিক। ওরা বন্দুকের নলের সামনে লড়ছে। আমরা নিরাপদে চুপচাপ। দেওয়ালে পিঠ না ঠেকলে কোনো শিক্ষিত লোক নড়ে না। আর শিক্ষিত লোক না নড়লে, সাধারণ লোক নড়লেও চোখে পড়ে না। নিজেদের আত্মসমালোচনা দরকার।

অসিত রায় বলেন, বাঙালি সত্ত্বাবোধকে জাগ্রত করার মধ্যে দিয়েই আমরা শাহবাগ আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে পারি।

রবিউল বলেন, ধর্মের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে মানবতাবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের কর্মসূচি নেওয়া দরকার।

বারাসাতের ব্রজেন্দ্রনাথ রায় বলেন, শাহবাগের চেয়েও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে চিন্তা করা দরকার। এখানে মৌলবাদের সঙ্গে লড়াই না করে, শুধু শাহবাগকে সাবাস জানিয়ে কোনো লাভ নেই। ক্যানিংয়ে দুশো বাড়ি পুড়িয়ে দিল মৌলবাদীরা আর আমরা শাহবাগ নিয়ে কাঁদছি।

যাদবপুরের শমীক সরকার বলেন, বাংলাদেশের যুব প্রজন্মের নিজস্ব ভাষাভিত্তিক কর্মকাণ্ড রয়েছে। রয়েছে আড়াই লক্ষের ওপর ব্লগার। ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে বাংলার ব্যবহারে ওরা পথিকৃত। এভাবে রাজনীতির পরিসরের বাইরে স্বাধীনভাবে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ দাঁড়াতে পেরেছে বলেই আমরা এই শাহবাগের আন্দোলন দেখছি। আমাদের এপার বাংলায় শিক্ষিত সমাজের স্বাধীনভাবে এখনও দাঁড়ায়নি।

উল্টোডাঙার অনুপম দাস অধিকারী, যিনি এই শাহবাগ সংহতি, পশ্চিমবঙ্গের আহ্বায়ক, তিনি বলেন, কলকাতায় শাহবাগ নিয়ে অনেকগুলো উদ্যোগ হয়েছে। সবাই এক জায়গায় নেই। এগুলির নিজেদের মধ্যে সংহতি না থাকলে মুশকিল।

শেষ বক্তা জিতেন নন্দী শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থনকে একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে বলেন, রাজনীতি যেভাবে পচে গেছে এবং বাতিল ও ধান্দাবাজ লোকজনের কাজ বলে পরিগণিত হয়েছে, সেখানে কমবয়সীদের যে কোনো সৃষ্টিশীল কর্মে উঠে দাঁড়ানোর দিকে আমাদের ভালোভাবে তাকিয়ে দেখা দরকার। দলের বাইরে বেরিয়ে এসে অহিংস উপায়ে শাহবাগের এই জমায়েতকে কোনো কৌশল নয়, একটি সচেতন রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে তিনি বর্ণনা করেন। 'শাহবাগ কী ও কেন' নামে একটি পুস্তিকা তৈরি করা দরকার বলে তিনি বলেন। এছাড়া তিনি 'রাজনৈতিক ইসলাম'–এর বিরোধিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, কারণ তা আমাদের দেশে 'রাজনৈতিক হিন্দুত্ব'–কেই পুষ্ট করবে।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 21 1 May 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

‘আমাদের গ্রামটাকে একটা ছোটোখাটো পাখিরালয় বলা যেতেই পারে’

সম্রাট সরকার, মদনপুর, ২৩ এপ্রিল •

কাজটা শুরু করেছিলাম গত বছর বর্ষার শেষে। আমার বন্ধু অরুণের সঙ্গে। পাখি নিয়ে কৌতুহল খুব বেড়ে গেছিল। আমার পুত্রের জন্য একটা পাখির বই কেনার পর থেকে। তারপর ভাবলাম, মানুষ তো সারা দুনিয়া জুড়ে পাখি নিয়ে পড়ে থাকে, দেখি না আমাদের গ্রামটায় কতরকমের পাখি আছে। অফিসের ফাঁকে ফাঁকে ছুটির দিনে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম আমাদের বয়সার বিলের মধ্যে। প্রথমে সবাই হাসাহাসি করত। আমি প্রায় প্রত্যেকবার আমার পুত্রকে নিয়ে যেতাম। তারপর প্রথম প্রথম যা হয় আর কী। চেনা পাখিগুলোকে ‘স্পট’ করা শুরু করলাম। খুব ভয়ে ভয়ে ফটো তুলতাম। যদি উড়ে যায়। দূর থেকে যা দেখা যায় তাই সই।

পরে আস্তে আস্তে সাহস বাড়ল। বলা যায় একটা জায়গায় বেড়িয়ে আসার পর। সেই জায়গাটা হল ভরতপুরের কেওলাদেও ঘানা জাতীয় উদ্যান। ওখানকার এক রিক্সাওয়ালা আমাকে পাখি দেখা, চেনা, ছবি তোলা অনেকটা শিখিয়ে দিয়েছে। শিখিয়েছে কীভাবে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হয় ঠিক সময়ের জন্য। ওখানে গিয়ে আমার একটা নেশা ধরে গেছিল পাখি দেখার। ফিরে এসে অরুণকে সব বললাম। আমাদের গ্রাম ঘোরার ভুত মাথায় জোরালো ভাবে চেপে বসল। কখনো ছেলের জলখাবার কোমরে বেঁধে পাখি দেখতে বেড়িয়েছি। অনেকবার বিলের কাদায় আমি, আমার স্ত্রী, অরুণ আর আমার পুত্র একেবারে মাখামাখি হয়ে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সব্বাই বকাবকি করেছে। বিলে সবসময় সাপের ভয়। এভাবে আস্তে আস্তে একটু খোঁজাখুঁজির পর আমরা নিজেরাই বুঝতে পারিনি কখন পাখির সংখ্যাটা ৮০ ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের গ্রামের অনেকে অনেক ভাবে সাহায্য করেছে আর এখনও করে। অনেকে কোনো পাখির স্থানীয় নাম বলে দিয়েছে। একজন ভাইয়ের কথা বলব, আমাকে ফোন করে বলেছে দাদা বিলে এখনই এসো, একটা বড়ো ময়ূরের মতো পাখি দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি Black Ibis –এর একটা জোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনোদিন ভোরবেলা বেরিয়েছি, একজন বলল নলা গাছের দিকে নীল রঙের ডাহুক আছে। গিয়ে দেখি purple swamphen। এখন আর আমাদের এলোপাথারি গ্রামের মাঠেঘাটে, বিলের কাদায় সময়–

অসময়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কেউ অবাক হয় না। উপরন্তু সাহায্য করে কোথাও কোনো পাখি দেখলে। তবে এখানেও এয়ারগান দিয়ে শামুকখোল মারার লোক আছে। আমরা বুঝিয়ে চেষ্টা করি এসব না করার। তবু মনে হয় সচেতনতা অনেক বাড়াতে হবে।

আমাদের কাঁচা হাতে একবছর চেষ্টা করার পর একটা ব্লগ খুলেছি, যেহেতু আমাদের বিলটার নাম বয়সা, আমাদের কাজটার মূল্যায়নের জন্য www.boisabirds.wordpress.com ।

আমরা তো সবে আট মাস হল পাখি স্পট করা শুরু করেছি। অনেক পাখি ছবি তুলে চিহ্নিত করেছি। আরও অনেক পাখি দেখেছি তবে ছবি তুলতে পারিনি। ভালো ক্যামেরার অভাব আর ছবি তোলার হাত কাঁচা হওয়ার জন্য। বিলের অনেক জায়গায় আমরা এখনও জল থাকা অবস্থায় যেতে পারিনি। আশা করি সময়ের সাথে সেগুলো কেটে যাবে। তখন কিন্তু আমাদের গ্রামটাকে একটা ছোটোখাটো পাখিরালয় বলা যেতেই পারে!

‘পুরুলিয়া আদিবাসী লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র’র সৃজনমেলা : শিল্পের মেশামিশি, জীবনের মহাসংগম

সুব্রত সরকার, কলকাতা, ২১ মার্চ •

‘পুরুলিয়ার লালমাটি, রূপে–গুণে পারিমাটি ... মঞ্চে তখন কোনো এক ঝুমুরশিল্পী বড়ো দরদ দিয়ে গাইছেন এ গান। এ কলি শুনে আপনার বুকটা আনচান করবেই। হৃদয় যদি খুব রুখা–শুখা, টুটা–ফুটা হয়, সেথায় একটা ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল ঢেউ উঠবেই। সৃজন ভূমিতে তখন যে দামামা বেজেছে। কাড়া–আকড়া বাজিয়ে, ধামসা–মাদল দম্‌দমাদম আর ভেঁপুতে পোঁ তুলে ঘোষণা হচ্ছে, শুরু হল ‘সৃজন উৎসব’। তিনদিনের এক মহতী উদ্যোগ। মানুষ মানুষে মিলনের এক মহাসংগম। অপরূপ এক নৈসর্গিক পরিবেশে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত এক আঙিনায় এ এক যথার্থ ভারতীয়তার উৎসব — সৃজন উৎসব।

তিথি ধরে প্রতিবছর তিনদিনের এই উৎসব শুরু হয় রাসপূর্ণিমা (কোজাগরি লক্ষ্মীপূর্ণিমার ঠিক পরের পূর্ণিমায়)। এই মেলা ১৮ বছর পার করে এবছর রাসপূর্ণিমায় (১৭–১৯ নভেম্বর, ২০১৩) উনিশে পা ফেলবে। ‘পুরুলিয়া আদিবাসী লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র’র উদ্যোগে প্রতিবছর এই আয়োজন করা হয়। বাংলার এই বৃহত্তম পার্বত্যমেলা সৃজন উৎসব। এ মেলার প্রাণপুরুষ তথা উৎসব সম্পাদক সৈকত রক্ষিত।

সৃজনমেলা মূলত লোকসংস্কৃতির মেলা। লোকসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এর অন্যতম উদ্দেশ্য। পুরুলিয়ার ছৌ, ঝুমুর, ভাদু, করম থেকে শুরু করে আমাদের দেশজ–গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির বাউল–ফকির, পদাবলী কীর্তন, মনসা মঙ্গলের পালাগান, ভাওয়াইয়া–চটকা–জারিসারি গান, মারফতির গান, হাসন রাজার গান, লালনের গান, জীবন–উজ্জীবনের গান, আদিবাসীদের নাচ–গান–যাত্রাপালা এবং প্রতিবেশী ভিন্ রাজ্য (আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, গুজরাত, রাজস্থান) থেকে আসা হরেকরকম চোখ ঝলসানো লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান তো আছেই। তাই পুরুলিয়া শহরে তখন পা ফেললেই আপনার চোখে পড়বে মেলার তোরণ। মেলার পোস্টার। সেখানে ঝলমল করছে এমন সব কথার ঝিকিমিকি, ‘আসিল সূত্র হিক্কিড় গিদিং বাজিছে মাদল! ঝমর ঝমর বাজে করতাল কিংবা কোথাও উঁকি মারছে, ‘পাহাড়ে পাহাড়ে দুন্দুভি, হৃদয়ে তার প্রতিধ্বনি। সৃজন উৎসব মানেই শৃঙ্গ বিজয়!’

এসব দেখে–পড়ে মন তো পুলকিত হবে। উড়ু উড়ু হবে। তো এবার আপনি ঝপাং করে বাসস্ট্যান্ড থেকে মানবাজারগামী একটা বাসে লাফ মেরে উঠে পড়ুন দেখি। ওমা! সেখানেও গুন গুন করছে এক দুষ্ট রসিক, ‘বধূঁ, তুমার সঙে সৃজন মেলায় রঙিলা লাচ লাচিব! টুঙুল টুঙুল বাজনা বাজিবেক! টুঙুল টুঙুল বাজনা বাজিবেক। ...’ বাসে লাফ মেরে তো উঠলেন। ‘ছিট’ কি পেলেন? জানলার ধারে যদি বসতে পেলেন তো জয় দুগ্‌গা! অই শোনঅ কে আবার গুন গুন করে, ‘বাস তো ছাড়িলো, কনডাকটার উঠিলো / চলো এবার সৃজন মেলায় যাই, তুমি–আমি এক সাথেতে গাই ...’

মাঠ–ঘাট–পথ–প্রান্তর, লালমাটির ধুলো উড়িয়ে বাস তো ছুটছে। পথের দু–পাশে কত না নয়নজুলি। ছোট্ট ডবা। গভীর দীঘি। সেখানে লাল শালুকের ফুল। জল ফড়িং–এর ওড়াওড়ি। আর অঘ্রাণের পাকা ফসলে খেত ভরে আছে। এসব দেখতে দেখতে এ যাত্রায় আপনার চোখ জুড়োবে। আপনি তো মেলার মানুষ। এই ফাঁকে টুকুস করে নেমে পড়ুন দেখি। ‘এ গাড়ি যাবে না, আমি অন্য গাড়ি নেব, হেই রোখও’ ... মনে পড়েছে এক নাগরিক কবিয়ালের এই গান। পড়ছে না? আরে সলিল কবিয়াল গো! তুমাদের সলিল চৌধুরী। ‘আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা, আর কতকাল আমি রব দিশাহারা ...’ না, না রসিক, হেথায় তুমায় কেউ প্রশ্ন করার নেই, কুথা হোতে আসিছো? কেন আসিছো? কুনও মতলব আছো নাকি গো? এখানে সবাই স্বাগত। মোস্ট ওয়েলকাম! এসো হে, বসো হে। পান–সুপারি খাও হে। দুটো নাচ–গান দেখো হে ... এ হামাদের সৃজনমেলা গো। বন্ধু, তোমাকেও চাই! ওই দ্যাখঅ আবার কানা বাউল কেমুন গাইছে, ‘হামি নাই জানি নাই জানি সখি, কথায় বৃন্দাবন গো / যেথায় দেখি বাগালছোলা সেথায় ঘুরে মন / হামার এই ত বৃন্দাবন গো।’

তা বাপু, এবার তো এক অন্য গাড়িতে চড়তে হবে। চলো হে পথিক, আগে চলো। ওই শুনঅ আবার, বাতাসে গান ভাসছে, ‘চলো মন ভ্রমণে, কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।’ এবার তুমি বান্দোয়ানগামী। কোনো একটা বাসে উঠে পড়। কাঁধের ঝোলা–ঝুলি সামলে হয়তো একটু হুটাপুটি করে উঠতি হতি পারে। মানুষে–মানুষে গা ঘষাঘষি হবে। চোখে–চোখে চাউনি হবে। ঝিলিক হবে! তা এট্টু হউক। তোমরা দুজানাই যে মেলার মানুষ। ধুলো মাখতে বেরিয়েছো।

বাস তো ছুটছে। গ্রাম, নদী, জঙ্গল, প্রান্তর পেরিয়ে ছুটছে। রাস্তার দু–পাশে সব গ্রাম। রাঙানো উঠোন। ঘরের দেওয়ালে কত চিত্রকলা। আদিবাসী গ্রাম গো সব। দু–পাশের প্রকৃতিও বড়ো সুন্দর। পলাশের জঙ্গল। উদার মাঠ। ধূ ধূ প্রান্তর। আকাশটাও যেন বড়ো বেশি নীল। একদম পলিউশন ফ্রি! ওই শুনঅ আবারও গান, ‘পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব সৃজন মেলায় ...’

বাস তো এসে থামল ঘড়িদুয়ারা–কুমারীগ্রাম। নামো। নামো শিগ্‌গির। এই তো মোদের সৃজনভূমি। টিলা–ডুংরি–মাঠ–জঙ্গল দিয়ে ঘেরা আমাদের মেলা সৃজনমেলা। ওই তো পাতা দিয়ে বানানো তোরণ দেখা যাচ্ছে, ‘বন্ধু, এসো হে, আসিল সৃজন! হিক্কিড় গিদিং বাজিছে মাদল ...’

লাজুক লাজুক পায়ে আগে ঢুলে তো পড়অ মেলায়। এবার চোখ জোড়া দাও ছড়িয়ে চারপাশে। ওই দেখো, টিলার চূড়ায় চূড়ায় মঞ্চ! ওই আমাদের শৃঙ্গবিজয়! আহা, কী সব নাম এক একটা মঞ্চের। সবার ওপরে ওই দেখা যায় একদম চাঁদের কাছাকাছি যে মূল মঞ্চ তার নাম ‘কিষ্কিন্ধা শিল্পপীঠ’। একদম নিচে, টিলার পাদদেশে ধুলোমাখা ভূমিতে মুক্তমঞ্চ ‘চিত্রকূট শিল্পপীঠ’। তুমি দেখো না কত দেখবে মেলা। এ মেলা এক সব পেয়েছির মেলা। তিন মঞ্চে তিনরকম অনুষ্ঠান একই সঙ্গে হচ্ছে। তুমি যদি ছুটতে পারো, দৌড়ে দৌড়ে টিলায় উঠতে পারো, বুকে হাঁপ না ধরে, দমে যদি ঘাটতি না থাকে, ছোটও, দ্যাখঅ, হৃদয় জুড়ায়। চোখ সার্থক হবে। দিল দিওয়ানা হবে! নিজেকেই নিজে গুণ গুণ করে বলবে, ‘এমন মানব জনম আর কি হবে? মন যা কর ত্বরা কর এই ভবে! ...’

তিনরাত্রির এই মেলায় প্রায় তিনলক্ষাধিক লোকের মিলনমেলা হয়ে ওঠে এই সৃজনভূমি। আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা হবে আপনার। চোখকে বিশ্বাস করাতে হলে আপনাকে একবার আসতেই হবে। এ মেলা দিনে শুনশান, রাতে হাজারো গান। সারারাত ধরে চলেছে উৎসব। আসছে মানুষ। আসছে গাড়ি। মেলার একমাত্র পাহারাদার মাথার ওপরের মস্ত বড়ো ওই চাঁদটা। রাসপূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদ তো নয় যেন এক পাঁচকেজি চিনির গোলবাতাসা। তার জোছনা কী মিষ্টি কী মিষ্টি!। হামাগুড়ি দিয়ে যেন পিঁপড়ের মতো হেঁটে যায় কত কত মানুষের ঢল সে চাঁদের দিকে। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যায় সারা সৃজনভূমি। আলোয় যেতে যায় মানুষজনেরা। ‘আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা ...’, এ হল সেই আলো!

গ্রাম–গ্রামান্তর, মাঠ–ঘাট–প্রান্তর পেরিয়ে মানুষ খেত–খামেরে ধান ফেলে রেখে ঘরে আসা কুটুমকেও সঙ্গে নিয়ে আসে তিনদিন ধরে। কত কত শিল্পী। কত বিচিত্র নাচ–গান–বাদ্যবাজনা। হেথায় রবিঠাকুরও থাকেন! তাঁর কীর্তনাঙ্গের গান মোহিত করে দেয় হেটী–মেঠো মানুষগুলোকেও!

শবর নৃত্য, রণপা নৃত্য, পুরাতনী গান, বাই নাচ, ডাঁইড় নাচ, পাঁতা নাচ, নাচনীনাচের আসর, ভাওয়াইয়া, চটকা, পদাবলী সংগীত এমন সব মন জুড়ানো নাচ–গান অপেক্ষা করে থাকে রসিকজনেদের জন্য। এছাড়াও, গুজরাতের সিদ্ধিদামাল, মণিপুরের মার্শাল আর্ট, ডিব্রুগড়ের মিশিং ডাল।

তুমি যদি রসিক হও, সুজন হও, মন উড়ু উড়ু মানুষ হও — একবার অন্তত এসো এই সৃজনমেলায়। এ এক অপরূপ তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমিতে স্নান কর। এ জীবন তোমার ধন্য কর। পূর্ণ কর। পুণ্য কর! ....

কীভাবে যাবেন? পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মানবাজার। দু–আড়াই ঘন্টার পথ। তারপর বাস বদল করে বান্দোয়ানগামী বাসে ঘুড়িদুয়ারা–কুমারীগ্রাম। এই দুই রাস্তাতেই বাস যোগাযোগ যথেষ্ট।

কোথায় থাকবেন? মেলার মাঠেই মাটিতে ত্রিপলের ওপর ঢালাও খড়বিচালির লম্বা বিছানা। চারপাশ ঘেরা কাপড়ের প্যান্ডেলে। একটু ধুলোমেখে গড়িয়ে নিতে হবে। যদি নিজস্ব টেন্ট নিয়ে যান, থাকতে পারবেন টিলার মাথায় কিংবা পলাশের জঙ্গলে। আর নদীর জলে চান, মেলার মাঠে খান। মাত্র দশ টাকার মিল কুপনে মেলা কমিটির হেঁশেলে সত্যিই সে এক মনোরম ভুরিভোজ।

লেখকের টেলিফোন ০৩৩–২৪১০–০৭৫৮

খ ব রে দু নি য়া

ইউরোপ জুড়ে কৃচ্ছসাধনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সমাবেশে মে দিবস পালন

স্পেন, গ্রীস, স্লোভেনিয়া, তুরস্ক — ইউরোপের দেশে দেশে সরকারগুলি পুঁজিবাদের সঙ্কট ঠেলে দিয়েছে শ্রমজীবীর ঘাড়ে। কর্মী সংকোচন, পেনশন–সুরক্ষা নষ্ট, বেতন হ্রাস, কর চাপানো চলছে। তার বিরুদ্ধে এবার মে দিবসে ইউরোপ জুড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে শ্রমিকরা। স্পেনের বার্সিলোনায় এমনই এক মিছিলের ছবি এএফপি–র সৌজন্যে।

দূষণবিরোধী সাইকেল র‍্যালিতে মোটরবাইক! প্রতিবাদ

২১ এপ্রিল, মহেশতলা • *জিতেন নন্দী,*

বসুন্ধরা সপ্তাহ (১৬–২২ এপ্রিল) চলছে। আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা ক–জন সাইকেলে রওনা হলাম রবীন্দ্রনগর থেকে বাটা মোড়। পাড়ার ভিতর দিয়ে আকড়া পুরোনো বাজার হয়ে সোজা গঙ্গার ধার বরাবর চললাম বাটা কলোনির দিকে। কলোনির ভিতর দিয়ে বাটা মোড়ে পৌঁছালাম, তখন সকাল সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। অনেকেই সেখানে জড়ো হয়েছে সাইকেল নিয়ে।

সাইকেল মিছিল শুরু হবে। একটা ম্যাটাডোরে ট্যাবলো সাজানো হয়েছে, তার গায়ে বড়ো ব্যানারে লেখা আছে, ‘দূষণবিরোধী সাইকেল মিছিল’। ইতিমধ্যে এসে জড়ো হল কিছু মোটরবাইক। আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে, সাইকেল মিছিল শেষ হবে বজবজ চড়িয়াল চিলড্রেন্স পার্কে।

আমাদের সঙ্গেই ছিল ‘সন্তোষপুর প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু সায়েন্স সার্কেল’–এর শুভাশিষ ভট্টাচার্য (সবু)। সবু আমাকে বলল, ‘মোটরবাইক এই মিছিলে গেলে আমি কিন্তু যাব না।’ আমি উদ্যোক্তাদের সে কথা বলতে ওঁরা বললেন, ‘আগে থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, এখন কিছু করা যাবে না।’ আমরা সমস্বরে বললাম, ‘সে কী কথা! দূষণ বিরোধী সাইকেল মিছিলে বাইক যাবে কেন?’ সবু বলল, ‘মোটরবাইক চড়েই যদি সাইকেল মিছিল হয়, তাহলে তো আমরা সায়েন্স সার্কেলের তিনজন বাইকে চেপেই দশ মিনিটে এখানে পৌঁছে যেতাম। সাইকেল নিয়ে এলাম কেন?’ আমি উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করলাম, ‘যারা বাইক নিয়ে এসেছে, তাদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, ওদের ভুলটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।’ ইতিমধ্যে মহেশতলা উপ–পৌর প্রধান প্রশান্ত মণ্ডল মোটরগাড়িতে চেপে মিছিলে এলেন এবং তাঁর গাড়িটাও মিছিলের আগে আগে চলল।

ওরা আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে চলল। আগেই মিছিলের সকলকে স্পনসর করা গেঞ্জি আর টুপি দেওয়া হয়েছে। আমি, ‘সায়েন্স সার্কেল’ এবং ‘সাইকেল সমাজ’–এর বন্ধুরা বসুন্ধরা সপ্তাহ পালনের নামে এই হাস্যকর মিছিল থেকে বিরত হলাম।

সুজাপুরে ‘বসুন্ধরা দিবস’ পালন

পার্থ কয়াল, ফলতা, ৩০ এপ্রিল •

গত ২২ এপ্রিল ২০১৩ ফলতা ব্লকের সুজাপুরে, সুজাপুর মৎস্যজীবী সমিতির ঘরে উদযাপন হল ৪৩তম ‘বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস’। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ছিল : সুজাপুরের একটি অংশের মানুষ কীভাবে পুকুরের জলের ব্যবহার করছে তা নিয়ে একটি ম্যাপ, প্ল্যাস্টিকের ব্যবহার কীভাবে হচ্ছে তা বোঝাতে চার্ট ও মডেল, মোবাইল টাওয়ারের দূষণ সংক্রান্ত চার্ট, ইন্ড্রাস্টিয়াল পলিউশন সংক্রান্ত চার্ট, বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কিত মডেল ও চার্ট, পরমাণু বিদ্যুতের কুফল ও সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কিত চার্ট, স্থানীয় হারিয়ে যাওয়া পশুপাখির তালিকা ও একটি গাছের বাস্তুতন্ত্রের মডেল।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল
: manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.